International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XI, Issue-V, September 2025, Page No. 1-9
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.11.issue.05W.124

পতঞ্জলির দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সঞ্জয় পাল
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, রাইপুর ব্লক মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 07.08.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper presents a comparative analysis between the classical Yōga philosophy based on Maharṣi Patañjali's Yōga Sutras *and the modern interpretation of Yōga as presented by Swami Vivekananda. While both approaches aim at self-realization and ultimate liberation through the discipline of Yōga, they differ significantly in philosophical orientation, scope of application, and spiritual objectives. Patañjali's Yōga, rooted in the dualistic metaphysics of the Sāṅkhya system, follows the* Ashtanga Yōga *to attain* Kaivalya, *the complete isolation of* Puruṣa *from* Prakr̥ti. *In this system, restraint of mental modifications* (Citta br̥tti nirōdha) *and detachment are essential.*

On the other hand, Swami Vivekananda, though accepting Patañjali's Yōga system, reinterprets it through the lens of Advaita Vedanta and a humanistic worldview. He envisions Yōga not merely as a path to personal liberation but as a comprehensive discipline harmonizing Jñāna Yōga, Bhakti Yōga, Karma Yōga, *and* Raja Yōga *aimed at both spiritual growth and social welfare. Vivekananda's approach reflects ethical activism, service to humanity, and universal unity, making Yōga applicable and relevant even within household life.*

This study highlights the similarities between Patañjali and Vivekananda's systems such as self-discipline, moral purification, and introspection while also analyzing their differences, particularly in metaphysics, the concept of the self, and the ultimate goal of spiritual practice. Patañjali's Yōga is introspective, structured, and ascetic, whereas Vivekananda's Yōga is expansive, inclusive, and centered on the realization of the divine in every human being.

Keywords: Patañjali, Swami Vivekananda, Self-realization, Jñāna Yōga, Bhakti Yōga, Karma Yōga, Raja Yōga, Ashtanga Yōga.

মহর্ষি পতঞ্জলির দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগের ধারণাগুলি বিভিন্ন দিক থেকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। দুটি ধারণাই "যোগ" শব্দটির মূল অর্থ "যুক্ত হওয়া" বা "মিলিত হওয়া" কে ধারণ করে, তবে তাদের লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং প্রায়োগিক দিক থেকে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এই বিষয় গুলি আমি নিম্নে এই প্রবন্ধে আলোচনা করলাম।

পতঞ্জলির দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ:

যোগ দর্শনের মূল প্রণেতা হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি, যার "যোগসূত্র" এই দর্শনের প্রধান গ্রন্থ। যোগ শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো 'সংযোগ'। যোগ শব্দটি √যুজ + ঘঞ্ = যোগ। যুজ্ ধাতু থেকে "যোগ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'যুজ' ধাতু সংযোগ এবং সমাধি অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই "যোগ" শব্দের অর্থ করলে দাড়ায় জীবাত্মার সঙ্গে

পরমাত্মার সংযোগ। যোগ দর্শনে "যোগ" শব্দটিকে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ কে বোঝানো হয়নি। পতঞ্জলিযোগ দর্শনে যোগের লক্ষণ হিসাবে বলেছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (যোগসূত্র ১/২)। অর্থাৎ "চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধই হলো যোগ"। যোগের এই সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চিত্ত কি? তার বৃত্তিই বা কি এবং তা কয় প্রকার?, ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন এসে যায়। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে চিত্তেরবৃত্তিই হলো চিত্তবৃত্তি। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতির বিকার বুদ্ধি, অহংকার ও মন- এই তিনটি তত্ত্বকে যোগ দর্শনে 'চিত্ত' বলা হয়েছে। বৃত্তি শব্দের অর্থ হলো পরিনাম। চিত্তবৃত্তি বলতে বোঝায় "বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্যপরিণাম বিশেষা বৃত্তয়"। অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে চিত্ত সেই বিষয়ের আকার ধারণ করে। চিত্তের এই বিষয়াকারে পরিণতি বা আকার গ্রহণই হলো চিত্তবৃত্তি। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার - প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

ক. প্রমাণ - যে পদ্ধতিতে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব তাকে প্রমাণ বলে। যোগ মতে প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ আগম।

খ. বিপর্যয়- বিপর্যয় হল সংশয় ও ভ্রান্ত জ্ঞান। পতঞ্জলি বলেছেন- "বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্", (যোগসূত্র ১/৮) অর্থাৎ যে জ্ঞান বা বৃত্তি তার রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেনা, তারই নাম বিপর্যয়।

গ. বিকল্প- মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, "শব্দাজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ", (যোগসূত্র ১/৯) অর্থাৎ এমন অনেক বাস্তব অস্তিত্ব বিহীন শব্দ আছে, যা শুনলে একপ্রকার জ্ঞানবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তারই নাম বিকল্পবৃত্তি।

ঘ. নিদ্রা- মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিঃ নিদ্রা", (যোগসূত্র ১/১০) অর্থাৎ অভাবের যে প্রত্যয় তাকে অবলম্বন করে যে বৃত্তি হয় তাকেই নিদ্রা বলে। অভাব অর্থে জাগ্রত এবং স্বপ্নের অভাব। জাগ্রত ও স্বপ্নের অভাবে তমোমূলক যে চিত্তবৃত্তি তাই নিদ্রা। সেই নিদ্রা হল স্বপ্নহীন সুষুপ্তি।

ঙ. স্মৃতি- মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, "অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতি", (যোগসূত্র ১/১১) অর্থাৎ পূর্ব সংস্কার উদবুদ্ধ হলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে স্মৃতি বলে।

সমাধি ও তার বিভিন্ন প্রকার: চিত্তবৃত্তির লয়ই হল যোগ সমাধি। যোগদর্শনের মতে সমাধি দুই প্রকার-সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি: যোগ মতে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যোগ-সাধকের যে প্রথম সমাধিপ্রাপ্তি ঘটে, তাকেই বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। গীতাতেও বলা হয়েছে, "অভ্যাসেন হি কৌন্তেয় বৈরগ্যেন চ গৃহ্যতে" (৬/৩৫)। অর্থাৎ বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত মন্দীভূত হয় এবং অভ্যাসের দ্বারা বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়। সম্প্রজ্ঞাত শব্দটির অর্থ হল ধ্যেয় বিষয়কে প্রকৃষ্ট বা সম্যকভাবে জ্ঞাত হওয়া। অর্থাৎ বলা যায় যে সমাধির যে অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুকে সম্যভাবে জানা যায় সমাধির সেই অবস্থাকেই বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এরূপ সমাধিকেই বলা হয় ধ্যান-সমাধি, পূর্ণ-সমাধি নয়। মহর্ষি পতঞ্জলি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চার প্রকার ভেদ করেন, যথা- সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সম্মিত। কোনো স্থূল বাহ্যবিষয়ে চিত্ত ধ্যানে নিবিষ্ট হলে তাকে বলা হয় সবিতর্ক সমাধি। স্থূল বাহ্যবিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ আয়ত্ত হলে, যোগী যখন তন্মাদি সূক্ষ্ম বাহ্যবিষয়ে চিত্ত নিবেশ করেন, তখন তাকে বলা হয় সবিচার সমাধি। আবার যোগী যখন স্থূল আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিত্তনিবেশ করেন, তখন যে আনন্দপূর্ণ ভাবের উদয় হয়, তখন তাকে বলা হয় সানন্দ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। আর, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বা আত্মাই যখন ধ্যানের বিষয়রূপে গণ্য হয় তখন তাকে বলা হয় সাম্মিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল সবীজ সমাধি। কারণ, এই ধরনের সমাধিতে সংসার মহীরূহের বীজ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় না।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি: সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা চিত্ত নিজেকে বিষয়-চিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারে। চিত্তের এই নিরুদ্ধ অবস্থায় যে সমাধি হয় তাকেই বলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধি সম্ভব হয় পরবৈরাগ্যের অভ্যাসে। তাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্পর্কে যোগসূত্রে বলা হয়েছে, "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ" (যোগসূত্র-১/১৮)। এই সমাধিতে যোগীর সমস্ত প্রকার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকারের হয়- ভব প্রত্যয় ও উপায় প্রত্যয়। যারা প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি অনাত্ম বস্তুকে আত্মা মনে করে সেই বিষয়ে নিরোধ সমাধি সাধনা করেন তাদের সমাধিতে ভ্রান্তি থাকায় তাঁরা কৈবল্য লাভে কখনও সমর্থ হন না। নির্ধারিত সময়ের পরে তাঁরা পুনরায় সংসারে প্রবেশ করেন। তাদের সমাধি অবিদ্যা পূর্বক হওয়ায় তা ভব প্রত্যয় নামে অভিহিত হয়। আর

অপরদিকে যারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়ভূত শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও যোগাঙ্গ সমাধির সাহায্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করেন, তাদের সমাধির নাম উপায় প্রত্যয়।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল সমাধির শেষ স্তর। দীর্ঘকাল যোগ-অভ্যাসের দ্বারা এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব। যোগ-দর্শনে যোগ-অভ্যাসের নিয়মগুলোকে অষ্টাঙ্গ-যোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অষ্টাঙ্গ যোগ: যোগ হলো সাধনশাস্ত্র বা প্রয়োগবিদ্যা। যোগদর্শনে বিবেকখ্যাতিলাভের সাধনরূপে অষ্টাঙ্গ যোগের বর্ণনা করা হয়েছে। যোগাঙ্গের অভ্যাসে চিত্তের মালিন্য বা অশুদ্ধি নাশ হয়। যোগমতে চিত্তশুদ্ধি না হলে সমাধিলাভ করা যায় না। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তনিরোধ হয়- "অভ্যাসবৈরাগ্যাং তন্নিরোধঃ" (যোগসূত্র- ১/১২)। যোগাঙ্গ হল আটটি, এগুলি হল "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার ধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি" (সাধনপাদ-২৯) অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এখন যোগ দর্শন সম্মত যোগাঙ্গগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

ক. যমঃ যোগ সূত্রে যম অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ" (সাধনপাদ-৩০) অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি সাধনকে যম বলা হয়। এটি সাধারণত নিষেধাত্মক বিধি। অহিংসা হল সকল রকম জীব হিংসা থেকে বিরত থাকা। সত্য হল কায়মনোবাক্যে মিথ্যাচারণ না করা। অস্তেয় হল কোনভাবেই পরের দ্রব্যে স্পৃহা না করাই। ব্রহ্মচর্যহল সর্বপ্রকার কামভোগাদিতে সংযম। অপরিগ্রহ হল বিনা প্রয়োজনে অপরের দান গ্রহণ না করাই। এই সবগুলি যম সাধনার অঙ্গ।

খ. নিয়ম: যোগ সূত্রে বলা হয়েছে "শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ" (সাধনাপাদ-৩২) অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি সাধন হচ্ছে 'নিয়ম'। সদাচার অনুশীলনই নিয়ম। শৌচ দুই প্রকার যথা বাহ্য শৌচ যেমন প্রাত্যহিক স্নান, সাত্ত্বিক আহার, গৃহাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি। আন্তর শৌচ হল দয়া, মায়া, শুভ কামনা প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলন এবং কুচিন্তার বর্জন ইত্যাদির দ্বারা মানসিক শূচিতা অর্জন। সন্তোষ হল স্বল্পে তুষ্টি অর্থাৎ যা পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। তপঃ হল ব্রতাচার অনুশীলন এবং অন্যান্য কৃচ্ছ সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়কে সংযত করা। স্বাধ্যায় হল মোক্ষশাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ পাঠ। ঈশ্বর প্রণিধান হল সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা এবং সকল কর্মও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা। বিবেকজ্ঞান এর জন্য কেবল অশুভ সংস্কার (যম) পরিত্যাগ করলে চলবে না, শূভ বৃত্তির অনুশীলনও (নিয়ম) করতে হবে।

গ. আসন: যোগ সূত্রে বলা হয়েছে "স্থিরসুখমাসন" (সাধনাপাদ-৪৬) যোগসূত্রে বলা হয়েছে নিশ্চল ও সুখজনক উপবেশনই আসন। মনঃসংযমের জন্য বিভিন্ন প্রকার আসন অভ্যাস করা দরকার। দেহ মনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য দেহের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এছাড়া শারীরিক সুস্থতার জন্যও আসন অভ্যাস করা দরকার। সুস্থ দেহমনই চিত্ত সংযমের অনুকূল। উপযুক্ত গুরুর নিকট বিধান নিয়ে আসন অনুশীলন করা যায়। পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, শীর্ষাসন প্রভৃতি আসন যোগ লাভের সহায়ক।

ঘ. প্রাণায়াম: যোগ সূত্রে বলা হয়েছে "তস্মিন সত্য শ্বাস-প্রশ্বাসয়ো র্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ" (সাধনাপাদ-৪৯) অর্থাৎ বায়ুর শ্বাসরূপ আভ্যন্তরীণ গতি ও প্রশ্বাসরূপ বহির্গতির বিচ্ছেদই প্রাণায়াম বা বলা যেতে পারে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম তিন প্রকার। শ্বাস পরিত্যাগ করে ভিতরের বায়ুকে বাইরে স্থাপন করার পদ্ধতিকে রেচক বলে। বাইরের বাতাস শ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করে ভিতরে ধরে রাখাকে পূরক বা আভ্যন্তরবৃত্তি বলে। গৃহীত বায়ু দেহের মধ্যে ধরে রেখে সমগ্র শরীরকে বায়ু পূর্ণ করাকে কুম্ভক বা কুম্ভকবৃত্তি বলে। এইভাবে রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা শ্বাস-প্রশ্নসের স্বাভাবিক গতির মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়, তার মিলিতরূপ হল একটি প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের দ্বারা হৃদশক্তির বৃদ্ধি পায়, যা যোগলাভে সহায়ক। বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রাণায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন।

ঙ. প্রত্যাহার: যোগ সূত্রে বলা হয়েছে "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" (সাধনাপাদ-৫৪) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের স্ব স্ব বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে অন্তর্মুখীন করাকে প্রত্যাহার বলে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি যদি তাদের নিজ নিজ বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করা অসম্ভব ব্যাপার। ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখীন হলে চিত্তের বিষয়াসক্তিবিনষ্ট হয়ে স্থিরভাবে ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে যা যোগলাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

চ. ধারণা: যোগসূত্রে ধারণা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (বিভূতিপাদ-১) অর্থাৎ চিত্তকে কোন বস্তুতে দীর্ঘকাল ধরে রাখাকে ধারণা বলে। নিজ দেহের নাভিদেশ, ভ্রুযুগল মধ্যবর্তী স্থান প্রভৃতি বাহ্যবিষয়ও ধারণার বিষয় হতে পারে। এরূপ কোন একটি বিষয়ে যে লোক অধিককাল মনঃসংযোগ করতে পারে, সে লোক যোগ চর্যার উপযুক্ত। তাই যোগসাধনায় ধারণার গুরুত্ব অপরিসীম।

ছ. ধ্যান: যোগসূত্রে ধ্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছে "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" (বিভূতিপাদ-২) অর্থাৎ ধারণাতে জ্ঞানবৃত্তির একতানতাকেই ধ্যান বলে। ধারণার গভীরতর ও দীর্ঘস্থায়ীরূপ হল ধ্যান। ধারনার ক্ষেত্রে চিন্তার বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু ধ্যান হল অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহ। ধারণা ও ধ্যানের পার্থক্য বোঝানোর জন্য যোগীগণ জলের ধারা ও তৈলের ধারার উদাহরণ দিয়েছেন। জলের ধারার মধ্যে বিচ্ছেদ থাকে, কিন্তু তৈলের ধারার মধ্যে কোন বিচ্ছেদ থাকে না।

জ. সমাধি: যোগসূত্রে বলা হয়েছে, "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ" (বিভূতিপাদ-৩), অর্থাৎ ধ্যান যখন ধ্যেয়ের স্বভাবের আবেশে জ্ঞানাত্মক স্বভাবশূন্য হয় তখন তাকেসমাধি বলা হয়। সমাধি হ'ল ধ্যানের চরম উৎকর্ষ, চিত্তস্থৈর্যের সর্বোত্তম অবস্থা। প্রগাঢ় ধ্যানে বিষয়ের স্বভাবে চিত্ত আবিষ্ট হয়ে যখন আত্মহারা হয় তখন তাকে বলে সমাধি।এই সমাধিই হল অষ্টাঙ্গিক যোগের চরম তথা শেষ ধাপ। দীর্ঘকালীন এরূপ সমাধির অনুশীলন করলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় এবং সমাধির দ্বারা মোক্ষলাভ হয়।

অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম পাঁচটি যোগ অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার হল যোগের 'বহিরঙ্গ সাধন'। এই যোগগুলো চিত্তকে সমাধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য এই যোগগুলো প্রত্যক্ষভাবে সমাধির সঙ্গে যুক্ত নয়। এই যোগগুলোর বর্ণনা যোগসূত্রের সাধনপাদে পাই। অপর তিনটি যোগাঙ্গ অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হল যোগের 'অন্তরঙ্গ সাধন'। কারণ এই সাধনগুলো প্রত্যক্ষভাবে সমাধির সঙ্গে যুক্ত। এই তিনটি সাধন একত্রে 'সংযম' বলেও পরিচিত। এগুলোর বর্ণনা যোগসূত্রের বিভূতিপাদে পাই।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ:

সংস্কৃত "যোগ" শব্দটির একাধিক অর্থ বর্তমান। তবে যোগের আক্ষরিক অর্থ 'যুক্ত হওয়া' বা 'সংযোগ'। আবার যোগ বলতে 'সংযোগ' এবং একপ্রকার তপশ্চর্যা দুই-ই বোঝায়। স্বামী বিবেকানন্দ "যোগ" শব্দটির মধ্য দিয়ে এই দুই প্রকার বিষয়কেই বুঝিয়েছেন। বিধি-নিষেধ অনুসারে তপস্যা মুক্তিকামী ব্যক্তিকে ঐক্য ও মিলনের অনুভূতি দান করে। স্বামী বিবেকানন্দ যোগকে শুধু পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং এটিকে মানব জীবনের সার্বিক উন্নতির পথ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যোগকে "আত্মমুক্তির সাধনা" হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হলো ব্রহ্মত্ব বা দিব্যতা, এবং যোগের উদ্দেশ্য হলো সেই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মত্বকে প্রকাশ করা। স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি সমুচ্চয়কেই সমর্থন করেছিলেন। তবে তাঁর মতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, সমন্বিত যোগ একপ্রকারের নয়, বরং জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ এগুলিকে তিনি অমরত্ব উপলব্ধির এক-একটি স্বতন্ত্র পথ বলে দেখিয়েছিলেন। এই পথগুলি একটি অন্যটির পরিপূরক। যোগের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে চারটি হল প্রধান। যথা- জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ। এখন স্বামীবিবেকানন্দ এই চারটি যোগ কিভাবে দেখিয়েছেন তা আলোচনা করে দেখাবো।

জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানমার্গ-

জ্ঞান বলতে বোঝায় তত্ত্বজ্ঞান বা বস্তু স্বরূপের জ্ঞান, যাকে জানলে সবকিছু জানা হয়ে যায়। কোন কিছুই আর অজানা থাকেনা। তিনিই সত্যকে জানেন বা সত্যকে উপলব্ধি করেন। তিনি সকল প্রকার অজ্ঞানতার উর্ধ্বে অবস্থান করেন। তিনি কখনও অবিদ্যার বশবর্তী হতে পারে না। তাই জ্ঞানযোগে বলা হয়, নাম রূপের বাইরে গিয়ে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়েই মোক্ষ লাভ সম্ভব।

উপনিষদে বৈরাগ্যই তত্ত্বজ্ঞানের উপায় রূপে নির্দেশিত হয়েছে। যিনি মোক্ষলাভে উৎসুক তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার সুখভোগের প্রতিবৈরাগ্য আনয়ন করবেন। যার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর কাছে গিয়ে তত্ত্ববিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করবেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনেই উপনিষদ তথা বেদান্ত দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য জ্ঞান মার্গ। ন্যায় দর্শন মতেও তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ আত্মা এবং অনাত্মা বস্তুর পার্থক্য বিষয়ক

জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। সাংখ্য দর্শনেও জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে ভেদ জ্ঞান অর্জনই হলো জীবনের চরম লক্ষ্য একেই বলে বিবেক জ্ঞান। আর মোক্ষলাভের উপায় হল বিবেক জ্ঞান। মীমাংসা দার্শনিক মূলত কর্ম মার্গী হলেও তারা এ কথা বলেন যে, মোক্ষ লাভের জন্য বেদ বিহিত কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানও লাভ করতে হবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে যে মুক্তি লাভের বিভিন্ন উপায় এর মধ্যে জ্ঞানযোগ বা জ্ঞান মার্গ একটি অন্যতম উপায়। জ্ঞানের দ্বারা সংশয়বিহীন অবস্থা লাভ হয়। জ্ঞানের দ্বারায় সকল কর্ম বন্ধনের সমাপ্তি ঘটে। এই জ্ঞান হল তত্ত্বজ্ঞান; জ্ঞানের ফল হল মুক্তি। আচার্য শংকরের মতে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান অর্জনই মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের পথ বলতে বুঝেছেন, অজ্ঞতা জনিত 'বন্ধন' এর উপলব্ধি। তার মতে অজ্ঞতা হল বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারাই অজ্ঞতা। বিবেকানন্দের মতে জ্ঞানযোগের তিনটি ভাগ আছে, যথা- ১) শ্রবন- আত্মাই একমাত্র সৎ পদার্থ এবং অন্যান্য সবকিছুই মায়া- এই তত্ত্ব শোনাই হল শ্রাবন। ২) মনন- এই পর্যায়ে, শোনা জ্ঞান বা বিষয়টিকে গভীরভাবে চিন্তা ও বিচার করা। ৩) নিদিধ্যাসন- সমস্ত বিচার ত্যাগ করে শুধুমাত্র তত্ত্বকে উপলব্ধি করা। তত্ত্বের নিরন্তন ধ্যান এবং আত্মাকে তার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই যোগের একমাত্র পথ। এইযোগ কঠিনতম হলেও সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানযোগের পথে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে তা নির্দেশ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, পরমসত্যের উপলব্ধির জন্য চাই একাগ্রতা। আর একাগ্রতার জন্য প্রয়োজন দেহ ও ইন্দ্রিয় কে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছেন তার লেখায়- "প্রথমত ধ্যান নেতিমূলক হবে। অর্থাৎ সমস্ত চিন্তা কি দূর করে দিতে হবে। যা মনে আসে তা প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তাকে থামিয়ে দিতে হবে। এরপরদৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের যা প্রকৃত স্বরূপ সেই ব্যাপারে মনোনিবেশ করা। মনের মধ্যে তিনটি ভাব আনো, সৎ-চিৎ- আনন্দ। অস্তিভাব, জ্ঞানস্বভাব এবং প্রেমস্বরূপ ধ্যানের মাধ্যমেই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ঐক্যের অনুভূতি আসে। মনে হয়, যিনি দেখছেন এবং যাকে দেখা হচ্ছে, তাঁরা এক, অভিন্ন"। অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছা শক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকৃত আত্মস্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য নিরন্তর ধ্যান অভ্যাস করতে হবে। যা জ্ঞানযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই জ্ঞানযোগের অভ্যাসের দ্বারা আসে আত্মত্যাগ ও বৈরাগ্য। তত্ত্বজ্ঞানের নিরন্তর অভ্যাস দৈহিক কামনা-বাসনাকে প্রথমে নিয়ন্ত্রণ, তারপর নিঃশেষ করে, এটাই 'আত্মত্যাগ'। এই আত্মত্যাগ সমস্ত রকম স্বার্থপরতা থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে, একে বলে 'বৈরাগ্য'। আত্মত্যাগ ও বৈরাগ্যের সঙ্গে উন্মুক্ত হয় ব্রহ্ম উপলব্ধির দ্বার। ব্রহ্মানুভূতিতে আমাদের উপলব্ধি হবে- "ঊর্ধ্ব আমার দ্বারা পরিপূর্ণ, অধঃ আমার দ্বারা পরিপূর্ণ, মধ্য আমার দ্বারা পরিপূর্ণ। আমি নিজে সবকিছুতে আছি অর্থাৎ সর্বভূতে বিরাজিত। আবার সবকিছু অর্থাৎ সর্বভূত আমার মধ্যে বিরাজ করছে। ওম, তৎ, সৎ- আমিই সেই। আমি মনের ঊর্ধ্বে সৎস্বরূপ। আমি বিশ্বের একমাত্র আত্মা স্বরূপ। আমি সুখও নই, দুঃখও নই। আত্মা নয়, দেহই পান করে, আহার ইত্যাদি করে। কিন্তু আমি নই, মন নই। সোহহম্- আমিই সেই। আমি সাক্ষীস্বরূপ, আমি দ্রষ্টা। যখন দেহ সুস্থ থাকে, আমি সাক্ষী। আবার যখন কোন রোগ আক্রমণ করে তখনও আমি সাক্ষী স্বরূপ। আমি সচ্চিদানন্দ, আমি সার পদার্থ। জ্ঞানের অমৃত স্বরূপ। অনন্তকালে আমার কোন পরিবর্তন নেই। আমি শান্ত দীপ্যমান পরিবর্তন রহিত। আমি শান্ত, আলোকময়, আমার কোন পরিবর্তন নেই"।

বিবেকানন্দের এই জ্ঞানযোগের পরিচয় আমরা পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে, যেখানে ঋষি যজ্ঞবল্ক বলেছেন, আত্মজ্ঞানের একমাত্র উপায় হল শ্রাবন, মনন, নিদিধ্যাসন।

ভক্তিযোগ বা ভক্তিমার্গ-

ভক্তিযোগ অনুযায়ী মুক্তি লাভের উপায় পূজা-অর্চনা নয়, জ্ঞানমাত্র বা কর্মমাত্র নয়। এই উপায় হল আত্মোৎসর্গ ও ভগবতভক্তি। যিনি ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান, বিষয়াসক্তিশূন্য তার কাছে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ পন্থা। যারা কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের অনুসারী তাদের পক্ষেও ভক্তি অবশ্যিক ধর্ম। আচার্য রামানুজ বলেন, ভক্তির জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের আত্মসমর্পণ এবং ঈশ্বরই রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস।

ঈশ্বরকে উপলব্ধির একটি অন্তর্জাগতিক ও হৃদয়সম্পৃক্ত পথ, যেখানে প্রেম, শ্রদ্ধা ও আত্মনিবেদনই মূল সোপান। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানুষের অন্তর্নিহিত অনুভূতির এমন এক শক্তি রয়েছে, যা গভীর ভক্তির মাধ্যমে জাগ্রত হয়ে আত্মার গভীরতম স্তরে পৌঁছায় এবং সেই শক্তির মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেই ঈশ্বরকে জানতে পারে। তিনি

বলেন, সাধারণ প্রেম যখন পরম প্রেম বা ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগে পরিণত হয়, তখন তা ভক্তিমার্গে রূপ নেয়। ভক্তির বিভিন্ন স্তর নিয়ে বিবেকানন্দ যে বিশ্লেষণ করেছেন, তার সূচনা হয় শ্রদ্ধা দিয়ে। তিনি বলেন, মানুষ দেবস্থানকে শ্রদ্ধা করে, কারণ সেখানেই ঈশ্বরের আরাধনা হয় এবং সেই স্থান আধ্যাত্মিকতার এক বিশেষ অনুভব জাগিয়ে তোলে। তেমনই ধর্মগুরুর প্রতিও সকল ধর্মের অনুসারীরা শ্রদ্ধাশীল থাকেন। এই শ্রদ্ধার মূলেও থাকে একধরনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা—যাকে আমরা ভালোবাসি না, তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মায় না। এরপর আসে প্রীতি বা ঈশ্বরচিন্তায় আনন্দলাভ। মানুষ যেমন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণ পেতে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যায়, তেমনি ঈশ্বরের চিন্তাতেও একধরনের গভীর তৃপ্তি খুঁজে পায় ভক্ত। এই ভালোবাসা ঈশ্বরমুখী হয় এবং ইন্দ্রিয়জ উপভোগের চেয়ে অনেক গভীরতর হয়ে ওঠে। এরপরের ধাপে আসে বিরহ—এই বিরহ কোনো সাধারণ দুঃখ নয়, বরং প্রিয় ঈশ্বরকে না পাওয়ার আকুলতাজনিত এক মধুর যন্ত্রণা। ঈশ্বরের অভাবে মনে যে বেদনা জাগে, সেটাই বিরহ। এই অনুভূতি যখন প্রকট হয়, তখন সাধকের মন একপ্রকার অস্থিরতায় ভরে ওঠে। এরপর আসে পরাভক্তি, যেখানে সাধকের মন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তখন তার কাছে অন্য কোনো বিষয় আকর্ষণীয় মনে হয় না। যাঁরা ঈশ্বরকথায় নিমগ্ন, তারাই তার প্রকৃত বন্ধু হয়ে ওঠেন, অন্যদিকে যারা পার্থিব বিষয় নিয়ে কথা বলেন, তারা বিরক্তির কারণ হয়। এই ধাপে ভক্তির একাগ্রতা চূড়ান্ত রূপ পায়। এরপরে আসে 'তদর্থপ্রাণস্থান'—এ সময় ঈশ্বরভাবনাই জীবনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের স্মরণে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মধুর হয়ে ওঠে। এই প্রেমময় চেতনায় সাধক জীবনের গভীর অর্থ অনুভব করেন। সর্বশেষ পর্যায় হল 'তদীয়তা'। যদিও তাহলে তার হয়ে যাওয়া, সাধক যখন সিদ্ধি লাভ করেন তখন আসে এই তদীয়তা। যখন তিনি ভগবানের পা স্পর্শ করেন তখন তার প্রকৃতি পুরোপুরি পাল্টে যায়, পবিত্র হয়ে যায়। তখন তার জীবনের লক্ষ্যপূর্ণ। যারা আত্মায় পরমশান্তি পেয়েছেন, মনের জট যাদের ছিড়ে গেছে, তারাও ঈশ্বরকে নিরাসক্তভাবে ভক্তি করেন। এই ঈশ্বরকে দেবতারা মুক্তিকামীরা এবং ব্রহ্মবাদীরাও উপাসনা করে থাকেন।

ভক্তিযোগ অনুসারে এইভাবে যে ঈশ্বরকে ভালবাসে সে সমগ্র জগতকে ভালোবাসে, কেননা সে অনুভব করে সমগ্র জগৎটাই যে তার।

কর্মযোগ বা কর্মমার্গ-

বিবেকানন্দের মতে, 'কর্মযোগ' হল কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করা। ভালো অথবা মন্দ কর্ম করলে ঐ কর্মের ফল অবশ্যই ভালো বা মন্দ হবে। সৎকর্মের ফল সৎ এবং অসৎ কর্মের ফল অসৎ। তারফলে আত্মা চির বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, আত্মার মুক্তির কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। সৎকর্ম নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করতে পারে এবং এইভাবে নৈতিক শক্তির দ্বারা অনাসক্তির অভ্যাস হয়। যদি শুধু ভোগের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয় তাহলে ঐ কর্ম সেই বিশেষ ভোগটি উৎপাদন করলেও চিত্ত শুদ্ধ করবে না। সুতরাং ফলাসক্তি শূন্য হয়ে সমস্ত কর্ম করতে হবে।

কর্মযোগীকে সমস্ত ভয়, লোভ চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে হবে। প্রকৃত কর্মযোগী নাম, যশ, স্বর্গপ্রাপ্তি বা কোন জাগতিক সিদ্ধির জন্য কর্ম করেন না। নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই আমাদের মন শুদ্ধ হয়ে ওঠে। এবং আমরা সকলের সাথে নিজেকে এক করে চিনতে পারি।

প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মের উদাহরণ দিয়ে কর্মযোগের পথ সম্পর্কে বলেছেন, গীতা আমাদের কর্মযোগের শিক্ষা দেয়। যোগযুক্ত হয়ে আমাদের কর্ম করতে হবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় অহংকার থাকে না। যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করলে 'আমি এটা করেছি, ওটা করেছি'- এই বোধ তখনো থাকে না। তারা বলে যে, যদি এই অহং বোধ না থাকে, যদি এটা বিলুপ্ত হয় তবে মানুষ কিভাবে কর্ম করতে পারে? কিন্তু আমিত্ববোধ ত্যাগ করে যোগ যুক্ত চিত্তে কর্মকরলে তা অনন্ত গুণ উৎকৃষ্টতর হবে এবং প্রত্যেকেই নিজের জীবনে এটা অনুভব করে থাকবে।

গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কর্মই এভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন, তিনি যোগযুক্ত হয়ে সমস্ত কর্ম করেন। ব্যক্তিগত সার্থ খোঁজেন না। এভাবে কর্ম সম্পাদন দাঁড়ায় জগতের মঙ্গল হয়। তা থেকে কোন প্রকার অমঙ্গল হতে পারেনা। তিনি মনে করতেন এই নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই আমাদের মন শুদ্ধ হয়ে ওঠে। এবং পরম ঈশ্বরের সাথে নিজেকে এক বলে অনুভব করতে পারি।

রাজযোগ-

'রাজযোগ' হল যোগের আটটি শাখার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা মূলত মন এবং আত্মার উপর ভিত্তি করে। এই যোগের ধারণাটি প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক প্রথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'রাজযোগ' শব্দটি দুটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে— 'রাজা' অর্থাৎ রাজা বা শাসক, এবং 'যোগ' অর্থাৎ মিলন বা ঐক্য। এই যোগের মূল লক্ষ্য হল মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যাতে ব্যক্তি চেতনা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের উচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অভ্যন্তরীণ ধ্যান অনুশীলনকে সমগ্র মহাবিশ্বকে আয়ত্ত করার পথ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "রাজ-যোগ অভ্যন্তরীণ জগৎ থেকে শুরু করার, অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি অধ্যয়ন করার এবং এর মাধ্যমে, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব দেয় - অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়ই"। রাজ যোগকে যোগের রাজা হিসাবেও বিবেচনা করা হয় কারণ এটি সবচেয়ে কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং আধ্যাত্মিক পথগুলির মধ্যে একটি। ধ্যান এবং মন নিয়ন্ত্রণের এই পথটি এমন লোকদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত যারা যোগ দর্শনে পারদর্শী এবং মননশীল এবং যোগিক জীবনধারার নেতৃত্ব দেন।

রাজ যোগকে প্রায়শই 'শাস্ত্রীয় যোগ' হিসাবে উল্লেখ করা হয় কারণ এটি একটি একীভূত অনুশীলনে পদ্ধতিগতভাবে বিকশিত হওয়া যোগের প্রাচীনতম ব্যবস্থা ছিল। রাজ যোগের অনুশীলন ঋষি পতঞ্জলি দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁর বিখ্যাত যোগ সূত্রে সংকলিত করেছিলেন। সূত্রগুলি যোগিক ধ্যানের অনুশীলনকে আটটি অঙ্গ বা উপ-অভ্যাসে বিভক্ত করে। প্রথম চারটি অঙ্গকে বাহ্যিক অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং একই সাথে অনুশীলন করতে হয়। শেষ চারটি অঙ্গকে অভ্যন্তরীণ অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং ক্রমানুসারে অনুশীলন করা হয়।

রাজযোগের মূল ভিত্তি হল পতঞ্জলির যোগসূত্র, যেখানে আটটি ধাপ বা অষ্টাঙ্গ যোগ বর্ণনা করা হয়েছে। এই আটটি ধাপ হল: ১. যম - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি সাধনকে একসঙ্গে বলা হয় যম। ২. নিয়ম- নিয়ম হল সদাচার অনুশীলন। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান -এই পাঁচটি সাধন হলো নিয়ম। ৩. আসন- শারীরিক অবস্থান বা যোগাসন। ৪. প্রাণায়াম- শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়াম তিন প্রকার রেচক, পূরক ও কুম্ভক। ৫. প্রত্যাহার- ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ। ৬. ধারণা- মনোসংযোগ বা মনকে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর দিকে নিয়ে যাওয়া। ৭. ধ্যান- গভীর ধ্যান বা মনঃসংযোগ। ৮. সমাধি- আত্মার সাথে সম্পূর্ণ মিলন বা চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক অবস্থা।

রাজযোগের মাধ্যমে একজন যোগী শারীরিক, মানসিক, এবং আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নতি করতে পারে। এটি ধ্যান, আত্ম-অনুশাসন, এবং গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশে সহায়ক। রাজযোগকে কখনো কখনো 'ধ্যানযোগ' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়, কারণ এটি মূলত ধ্যান এবং মননশীলতার উপর ভিত্তি করে। এটি একজনকে আত্মসচেতনতার গভীরে নিয়ে যায় এবং চূড়ান্ত মুক্তি বা মোক্ষের পথে পরিচালিত করে।

এই ভাবে দেখা যায় স্বামী বিবেকানন্দ মোক্ষলাভের জন্য চারটি প্রধান পথ নির্দেশ করেছেন— জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এবং রাজযোগ। তাঁর মতে, এই পথগুলির প্রতিটিই মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুসরণযোগ্য এবং ব্যক্তি বিশেষের স্বভাব ও মানসিক গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জ্ঞানযোগ জ্ঞানের আলোয় মনের অজ্ঞানতা ও অপবিত্রতাকে সরিয়ে দেয়। এটি চিন্তা ও বোধের একটি গভীর প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে জাগতিক সুখের সীমা ছাড়িয়ে এক উচ্চতর আনন্দের উপলব্ধির দিকে এগিয়ে নেয়। এইভাবে অন্তর্জগতের শুদ্ধতা ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। ভক্তিযোগের মধ্যে বিবেকানন্দ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধিকরণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রেমকে তিনি সকল মানুষের জন্য এক অপরিহার্য আত্মিক উপাদান বলে মেনেছেন। কিন্তু অহংকার, লালসা, হিংসা ও লোভ প্রেমকে কলুষিত করে তোলে। এই যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরচিন্তা, প্রার্থনা, সত্যকথা ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের পবিত্রতা গড়ে ওঠে, যা আত্মার উন্নয়নের পথে সহায়ক। কর্মযোগের মাধ্যমে তিনি নিঃস্বার্থ কর্মের ধারণা তুলে ধরেছেন, যেখানে কর্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না রেখে কেবল কর্তব্যপালনকেই মুখ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এর ফলে এমন ব্যক্তিও, যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারেন। তিনি ফলাফলের ভার ঈশ্বরের উপর অর্পণ করার নিদান দিয়ে কর্মের মধ্যে অহং বিলোপের পথ দেখিয়েছেন। রাজযোগ এমন এক অভ্যন্তরীণ সাধনার পথ যা একাগ্রতা ও ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয়। যিনি এই পথ বেছে নেন, তাঁকে গভীর ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন

করতে হয়। একাগ্রতা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তি মনকে স্থিত ও অস্থিরতামুক্ত করতে শেখেন, যা আত্মসাধনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও স্বামী বিবেকানন্দযোগের চারটি পথের কথা বলেছেন তবু পরিনামে এই বিভিন্ন পদ গুলি একই লক্ষ্যে উপনীত হবে এমন কথাও তিনি বলেছেন। মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী এই পথগুলো নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ- যোগের এই পথগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। বস্তুত প্রত্যেকটি পথের সঙ্গেই অন্যান্য পথগুলির একটা সংযোগ ও সহচর্য আছে। এমন নয় যে, যিনি ভক্তিযোগে আপ্লুত হয়েছেন তার জ্ঞানযোগের কোন প্রয়োজন নেই।

উপসংহার:

মহর্ষি পতঞ্জলির দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগচিন্তার তুলনামূলক আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উভয়েই 'যোগ' শব্দটির মূল অর্থ—'আত্মা' ও 'পরমাত্মার' সংযোগ বা একত্ব। গভীরভাবে ধারণ করলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োগ ও উদ্দেশ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। পতঞ্জলি যেখানে চিত্তবৃত্তির নিরোধ তথা মানসিক প্রশান্তি ও সমাধির মাধ্যমে কৈবল্যলাভকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং অষ্টাঙ্গযোগের শৃঙ্খলিত পদ্ধতির মাধ্যমে ধ্যানের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে বলেন, সেখানে বিবেকানন্দ যোগকে একমাত্র ধ্যান বা চিত্ত নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ না রেখে মানবজীবনের সার্বিক আত্মোন্নতির এক উপায় হিসেবে দেখেছেন। তিনি যোগের চারটি পথ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ উল্লেখ করে বলেছেন যে ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোনো একটি বা একাধিক পথ অনুসরণ করেই মোক্ষলাভ সম্ভব। পতঞ্জলি যোগকে মনসংযমের বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও বিবেকানন্দ যোগকে যুক্ত করেছেন আধ্যাত্মিকতা, মানবতা ও আত্মজাগরণের সঙ্গে। তবে সমালোচনামূলক ভাবে বললে, বিবেকানন্দের যোগদর্শন যতটা সার্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক, পতঞ্জলির যোগদর্শন ততটাই শৃঙ্খলিত, বিশ্লেষণাত্মক এবং ধ্যাননিষ্ঠ। পতঞ্জলি যেখানে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দেন, সেখানে বিবেকানন্দ বাহ্যিক কর্মজগতের সঙ্গে যোগসাধনার সংযোগ স্থাপন করে এক গভীর মানবিক আদর্শ নির্মাণ করেছেন, যা আধুনিক সমাজে আরও প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে পতঞ্জলির দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আলোচনা করে দেখালাম।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৯।

২. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮।

৩. ত্রিপাঠী, যদুপতি ও ত্রিপাঠী, ডঃ অশ্রুলেখা। ভারতীয় দর্শন পরিচয়। বি.এন পাবলিকেশন্, কলকাতা, ২০১৫

৪. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮।

৫. বসু, সুতপা। ভারতীয় দর্শন। শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।

৬. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় নীতিবিদ্যা। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৮।

৭. সামন্ত, ডঃ বিমলেন্দু। নীতিতত্ত্ব। স্মার্ট বুকস্, কলকাতা, ২০২১।

৮. ঘোষ, গোবিন্দ চরণ। সমকালীন ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০।

৯. বন্দোপাধ্যায়, ডঃ নিখিলেশ। বিংশ শতাব্দী ভারতীয় দর্শন। সদেশ, কলকাতা, ২০১৬।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সৈকত। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন। নবোদয় পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ২০২৪।

১১. স্বামী বিবেকানন্দযোগ। কার্যকর কার্যালয়। কলকাতা ১৯২২।

১২. স্বামী বিবেকানন্দ। ভক্তিযোগ। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৬৩।

১৩. স্বামী বিবেকানন্দ। কর্মযোগ। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯২২।

১৪. স্বামী বিবেকানন্দ। রাজযোগ। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯২২।

১৫. স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা (৩য় খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৬০।

১৬. পাতঞ্জল যোগ দর্শন। শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্য।

১৭. পাতঞ্জলসূত্র। কালীবর বেদান্তবাগীশ।

১৮. ভাষ্যসহ যোগসূত্র। পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু।

19. Basant Kumar Lal. Contemporary Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, Delhi, 1992.
20. Jadunath Sinha. Indian Philosophy, Vol-II. Motilal Benarsidass, Delhi, 2006.
21. Hiriyanna, M. Outlines of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, 2000.
22. Sharma, Chandradhar. A Critical Survey of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, 1960.
23. Bhattacharya, R. Sāṅkhya Philosophy: A Critical Analysis. Manohar Publishers, 2011.